কপটতা থেকে মুক্ত
মুক্তিযুদ্ধের চেতনা

মুহাম্মাদ মিক্বদাদ
আল-কায়েদা উপমহাদেশের একজন মুজাহিদ

আন-নাসর মিডিয়া
অক্টোবর ২০১৭

بسم الله الرحمن الرحيم

কেন এই বিষয়ে লেখা

স্বাধীনতা মানুষের এক সহজাত প্রবৃত্তি। মানুষ চায় স্বাধীন হতে, অন্য মানুষের দাসত্ব সে কখনও খুশিমনে গ্রহণ করতে পারেনা। তাই, যুগে যুগে মানুষ স্বাধীনতা অর্জনের জন্য যুদ্ধ করে গেছে, করছে এবং ভবিষ্যতেও করবে। একজন বাঙালি হিসেবে ছোট থেকেই মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা সংগ্রামের বিষয় নিয়ে অনেক আগ্রহ ছিল। শৈশব থেকে ব্রিটিশদের দুইশ বছরের নির্যাতন নিষ্পেষণের ইতিহাস, ব্রিটিশদের সাথে হাত মিলিয়ে হিন্দু জমিদারদের অত্যাচারের ইতিহাস, এরপর পাকিস্তানী সামরিকবাহিনীর হত্যাযজ্ঞের ইতিহাস – এসবই আমাকে মুক্তিযুদ্ধ বা স্বাধীনতা সংগ্রামের এবং মুক্তিযোদ্ধাদের ব্যাপারে আগ্রহী করে তোলে। সেই আগ্রহ থেকে শুরু হয় অনুসন্ধান – সত্যিকার মুক্তিযুদ্ধের চেতনা কি আর কারাই বা এর ধারক ও বাহক।

ভারতের কিছু দালালদের মুখে "মুক্তিযুদ্ধের চেতনা" শব্দটা অনেক শুনেছি; কিন্তু তাদের আচার-আচরণ থেকেই বুঝেছি তাদের কাছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা একটা পণ্য, যেই পণ্য বিক্রি হয় ইসলামের বিরোধিতার মাধ্যমে এবং বিক্রির বিনিময়ে এরা হিন্দুদের কাছ থেকে পায় নানারকম সুযোগ সুবিধা। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি তাঁর বান্দাদের পথহারা করে ছাড়েননা। তিনি সত্য। তাই যে খোলা মন নিয়ে সত্যের দিকে অগ্রসর হয়, তিনি তাঁদের পথ দেখান। তিনি বলেনঃ

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

যারা আমার পথে সাধনায় আত্মনিয়োগ করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করব। নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণদের সাথে আছেন।[1]

তাই আমার অনুসন্ধানের ফলস্বরূপ, সত্যিকার মুক্তিযুদ্ধ কি তা আমার কাছে পরিষ্কার হওয়া শুরু হয়ে যায়। পেশাজীবনের শুরুতে যথেষ্ট ক্যারিয়ার সচেতন এক সহকর্মী আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল ভবিষ্যতে আমি কোন পথে ক্যারিয়ার গড়তে চাই, আমি তাঁকে বলেছিলাম মুক্তিযোদ্ধা হতে চাই। সে হেঁসেই উড়িয়ে দিয়েছিল আমার কথাটা। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ আমার সেই স্বপ্নপূরণ করেছেন, আজ আমি আমার প্রত্যাশিত পথে আমার ক্যারিয়ার গড়তে পারছি। আমি আফগানিস্তানে সত্যিকার মুক্তিযোদ্ধাদের দলে যোগ দিতে পেরেছি; সেই মুক্তিযোদ্ধাদের দলে যারা মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত করার কাজে নিবেদিত, যারা আল্লাহর সৈনিক, কোন মানুষ বা তথাকথিত সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী কোন "রাষ্ট্রের" সৈনিক নয়। আল্লাহর কাছে দু'আ করি তিনি যেন আমাকেও এঁদের মত একজন সত্যিকার মুক্তিযোদ্ধা বানিয়ে দেন। আমিন!

তো সত্যিকার মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে পেরে, নিজের উপর আল্লাহর এই নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করার জন্য প্রকৃত মুক্তিযুদ্ধের বিষয়ে সবাইকে জানানোর জন্য অনেক আগে থেকেই লেখার ইচ্ছা ছিল। সম্প্রতি "মুক্তিযুদ্ধের চেতনার" দাবিদার বর্তমান বাংলাদেশ সরকার যখন আরাকানে মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে বার্মিজ সেনাবাহিনীর সাথে মিলে সামরিক অভিযানের প্রস্তাব দেয় এবং নিজেদের কপটতা, দ্বিমুখীতাকে পুরোপুরি প্রকাশ করে দেয়, তখন এই বিষয়ে লেখা আরও জরুরী মনে করি। আল্লাহর শাহী দরবারে প্রার্থনা তিনি যেন আমার এই লেখার মাধ্যমে মানুষের সামনে সত্যিকার মুক্তিযোদ্ধাদের পরিচয় আরও সুস্পষ্ট করে দেন এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে, মানুষের কুরবানিকে যারা পণ্য হিসেবে ব্যবহার করে তাদের কপটতাকে উন্মুক্ত করে দেখান; সাথে সাথে কপটদের ও তাদের অন্ধ অনুসারীদের মাঝে যারা হেদায়েত পাওয়ার যোগ্য তাদের হেদায়েত দেন।

সত্যিকার মুক্তিযুদ্ধ কি?

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজে সে একতাবদ্ধ হয়ে বাস করে। এজন্য তাকে নির্দিষ্ট অনুশাসন ও আইনকানুনের অনুগত হয়ে চলতে হয়। যখন সে এইসব নিয়মানুবর্তিতা থেকে মুক্ত হয়ে সমাজে চলতে চায়, তখন তার এই স্বাধীনতা রূপ নেয়

[1] সূরা আল আনকাবুতঃ ৯৬

স্বেচ্ছাচারিতায়। আর যে সমাজে সবাই স্বেচ্ছাচারী হয়, সেই সমাজ অচল হতে বাধ্য। কাজেই, আনুগত্যহীন স্বাধীনতা প্রকৃতপক্ষে কোন স্বাধীনতাই নয়, এটা আসলে স্বেচ্ছাচারিতা। প্রশ্ন হল কোন অনুশাসন ও আইনকানুনের অনুগত হলে প্রকৃত স্বাধীনতা পাওয়া যাবে?

যখন এই আইনের উৎস হয় মানুষের দ্বারা বিকৃত অথবা মানুষের বানানো কোন ধর্ম (এক্ষেত্রে ভণ্ড ধর্মযাজকেরা নিজেদের বানানো কথা, অনুশাসন আল্লাহর নামে চালায়) তখন সাধারণ মানুষ ভণ্ড ধর্মযাজকদের দাসে পরিণত হয়, মানবতা হয় মানুষের দাসত্বে বন্দী। আবার, যখন এই ভণ্ড ধর্মযাজকদের থেকে বাঁচতে যেয়ে, মানুষ ধর্মমুক্ত আইনসভাকে (এক্ষেত্রে ধর্ম থেকে সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্পূর্ণ আলাদা করে দেওয়া হয় এবং মানুষ নিজেই আইনের উৎস হয়ে সমাজের সব মানুষের জন্য বিধান রচনা করে) আইনের উৎস বানিয়ে ফেলে, তখন সাধারণ জনগণ শাসকশ্রেণীর দাসে পরিণত হয়। এমন সমাজে মানুষ খোলাখুলিভাবে রাষ্ট্র নামের এক অস্তিত্বহীন সত্ত্বার আড়ালে শাসকশ্রেণীর সার্বভৌমত্ব মেনে নিতে বাধ্য হয়।

সমস্ত বিশ্বজগৎ যার নিয়মের অধীন, সেই রবের দেওয়া স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিকেও তাঁরই নিয়মনীতির অধীন বানিয়ে দেওয়া হল স্বভাবজাত আচরণ। কিন্তু সেটা না করে, **মানুষ যখন স্বরচিত বা বিকৃত ধর্মের নামে অথবা আল্লাহর শাসনকে সরাসরি অস্বীকার করে নিজেই নিজের বানানো আইনকানুন দিয়ে সমাজ পরিচালনা করে, তখন অন্য মানুষেরা এই যাজক ও শাসক শ্রেণীর বানানো নাম ও বিধানের দাসত্ব করতে বাধ্য হয় – হোক সে নাম রাষ্ট্রের অথবা কোন দেবদেবীর।** এজন্য ইউসুফ (আ) মুশরিকদের ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার সময় বলেছিলেন –

مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ ۚ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۚ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে নিছক কতগুলো নামের এবাদত কর, সেগুলো তোমরা এবং তোমাদের বাপ-দাদারা সাব্যস্ত করে নিয়েছে। আল্লাহ এদের কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি। আল্লাহ ছাড়া কারও বিধান দেবার ক্ষমতা নেই। তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করো না। এটাই সরল পথ। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না।[2]

যারা নিজেদের অজ্ঞতার কারণে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রব্যবস্থার সাথে ইসলামের কোন সংঘর্ষ দেখতে পাননা, তারা হয়ত জানেন না - **কুরআনে আল্লাহ তা'আলা শাসনব্যবস্থাকে দ্বীন বা ধর্ম হিসেবে উল্লেখ করেছেন।** আরবি ভাষায় দ্বীন শব্দটির অর্থ শুধু কিছু বিশ্বাস এবং প্রথার নাম নয় বরং এর মাঝে শাসনব্যবস্থাও অন্তর্ভুক্ত। আরবি ভাষায়, দ্বীন (دين) শব্দটির অর্থ কি তা আলোচনা করতে যেয়ে ইমাম ইবনু তাইমিয়া (র) বলেন,

وَالدّين يتَضَمَّن معنى الخضوع والذل يُقَال دنته فدان أى أذللته فذل

"আর দ্বীন (دين) শব্দটির মাঝে বশ্যতা মেনে নেওয়া বা অধীন হওয়ার অর্থটিও অন্তর্ভুক্ত। আরবিতে বলা হয়ে থাকে دنته فدان অর্থাৎ আমি তাকে বশীভূত করলাম ফলে সে বশ্যতা স্বীকার করল"।[3]

এজন্যই, শাসনব্যবস্থাকে দ্বীন আখ্যা দিয়ে আল্লাহ বলেন –

مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ

বাদশাহর দ্বীনে (আইনে) সে নিজের ভাইকে কখনও নিতে পারত না।[4]

কাজেই, **ধর্মহীন শাসনব্যবস্থাগুলোও আসলে এক ধরণের ধর্ম বা দ্বীন আর এখানেও সাধারণ মানুষ শাসনব্যবস্থার বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য থাকে।**

---

[2] সূরা ইউসুফঃ ৪০

[3] ইমাম ইবনু তাইমিয়া (র) সংকলিত "আল-উবূদিয়্যাহ" এর দ্বীন, ইসলাম, ঈমান ও ইহসান অনুচ্ছেদ

[4] সূরা ইউসুফঃ ৭৬

বর্তমান বিশ্বে গণতন্ত্রের নামে ধোঁকা দিয়ে মানবতাকে মুক্ত করার কথা বলে মানবতাকে দাস বানানোর জন্য সশস্ত্র আগ্রাসন ও মিডিয়ায় প্রচার-প্রোপাগান্ডা চলছে। এ বিষয়ে একটু পরেই স্বল্প পরিসরে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ। সেই আলোচনার আগে মুক্তি বা স্বাধীনতা এবং মুক্তিযুদ্ধ কি, সেই আলোচনা পুরো করতে চাই।

মানুষের প্রকৃত মুক্তি তাকে সেই সমাজব্যবস্থায় নিয়ে যাওয়ার ভেতরে, যেই সমাজব্যবস্থার রীতিনীতি ও অনুশাসন কোন মানুষের বানানো নয়, বরং যেই সমাজব্যবস্থার রীতিনীতি ও অনুশাসন সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ অর্থাৎ যেই সমাজব্যবস্থা হল শরীয়তভিত্তিক সমাজব্যবস্থা। শরীয়তভিত্তিক সমাজব্যবস্থাতেই সব মানুষের জন্য রয়েছে স্বেচ্ছাচারিতামুক্ত প্রকৃত স্বাধীনতা। **এই শাসনব্যবস্থায় সর্বোচ্চ পর্যায়ের নেতা থেকে শুরু করে নিঃস্ব-সহায়সম্বলহীন পর্যন্ত সবাই আল্লাহর ইবাদত করে, কেউ কোন মানুষের দাসত্ব করেনা। আর এই শরীয়তের জন্যই যারা যুদ্ধ করে তারাই হল প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা।** এরকম মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন আমাদের নবী (ﷺ) ও তাঁর সাহাবীরা (রা)। এজন্যই তাঁরা যখন পারস্যের মানুষকে কিসরার দাসত্ব থেকে মুক্ত করতে গেলেন, তখন মুশরিক সেনাপতি রুস্তম তাঁদের জিজ্ঞাসা করেছিল, তোমরা এখানে কেন এসেছ? তাঁদের জবাব ছিল –

اللَّهُ ابْتَعَثَنَا لِنُخْرِجَ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَى عِبَادَةِ اللَّهِ ، وَمِنْ ضيق الدنيا إلى سِعَتِهَا، وَمِنْ جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَى عَدْلِ الْإِسْلَامِ

আল্লাহ আমাদের পাঠিয়েছেন তিনি যাকে চান তাকে **সৃষ্টির দাসত্ব থেকে আল্লাহর (সমস্ত সৃষ্টির স্রষ্টার) ইবাদতে, দুনিয়ার সংকীর্ণতা থেকে এর প্রশস্ততার দিকে, বাতিল ধর্মগুলোর অন্যায় অবিচার থেকে ইসলামের ন্যায়পরায়ণতার দিকে মুক্ত করার জন্য।**

রুস্তম যখন তাঁদের জিজ্ঞাসা করল –

أَرَأَيْتَ إِنْ دَخَلْنَا فِي دِينِكُمْ أَتَرْجِعُونَ عَنْ بِلَادِنَا

যদি আমরা তোমাদের দ্বীন (ইসলাম) গ্রহণ করি, তাহলে তোমরা কি আমাদের দেশ থেকে চলে যাবে?

তাঁদের জবাব ছিল –

إِي وَاللَّهِ ثُمَّ لَا نَقْرَبُ بِلَادَكُمْ إِلَّا فِي تِجَارَةٍ أَوْ حَاجَةٍ.

হ্যাঁ, অবশ্যই। আল্লাহর কসম, এরপর ব্যবসায়িক কাজ অথবা কোন প্রয়োজন ছাড়া তোমাদের দেশের কাছেই আমরা আসবনা।[5]

এটাই হল প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের বৈশিষ্ট্য। আরব জাতীয়তাবাদ অথবা পারস্যের রাজা কিসরার রাজভাণ্ডার বা ধনসম্পদ লুট করার জন্য তাঁরা পারস্যে অভিযান করেননি। আজও যারা শরীয়তের জন্য লড়াই করছে, তারাও মানুষের মুক্তির জন্য লড়াই করছে, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য লড়াই করছে; দুনিয়ার কোন ফায়দা বা নিজ দেশের প্রভাব প্রতিপত্তির জন্য তারা লড়াই করছেনা। এর কারণ, তাদের রব ও আমাদের রব, সমস্ত সৃষ্টিজগতের রব, আল্লাহ, বলেনঃ

تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِي الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ

এই পরকাল আমি তাদের জন্যে নির্ধারিত করি, যারা দুনিয়ার বুকে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে ও ফাসাদ সৃষ্টি করতে চায় না। আর আল্লাহভীরুদের জন্যে শুভ পরিণাম।[6]

আর, আমাদের রাসূলের (ﷺ) শিক্ষাও হল -

مَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ يَدْعُو إِلَى عَصَبِيَّةٍ أَوْ يَغْضَبُ لِعَصَبِيَّةٍ فَقِتْلَتُهُ جَاهِلِيَّةٌ

[5] ইমাম ইবনু কাসির (র) সংকলিত "আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া" গ্রন্থের সপ্তম খণ্ড, ১৪তম হিজরি, কাদেসিয়া অভিযান

[6] সূরা আল-ক্বাসাসঃ৮৩

যে ব্যক্তি অন্ধত্বের ঝাণ্ডাতলে যুদ্ধ করে, অন্ধ জাতীয়তাবাদের দিকে আহবান করে অথবা অন্ধ জাতীয়তার জন্য ক্রোধান্বিত হয়, তার মৃত্যু জাহিলিয়াতের (অর্থাৎ কুফরি অবস্থার) মৃত্যু।[7]

গণতন্ত্রের নামে ধোঁকা দিয়ে মানুষকে দাস বানানোর কৌশল

আগের পরিচ্ছেদেই বলা হয়েছে, বর্তমান যুগে সারা দুনিয়া জুড়ে মানবতাকে ধোঁকা দিয়ে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করার জন্য চলছে গণতন্ত্রের নামে প্রচার প্রপাগাণ্ডা। **পশ্চিমা শক্তিগুলো তথা আধুনিক বৈশ্বিক শাসনব্যবস্থার নেতারা সাধারণ মানুষের মাঝে এই মতবাদ প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট যে, মুক্তির চেতনায় হল গণতন্ত্রের চেতনা।** বৈশ্বিক শাসকগোষ্ঠীর এই ধোঁকাকে এই পরিচ্ছেদে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরার জন্য এখানে যে বিষয়গুলোর আলোচনা জরুরী মনে করছি সেগুলো হলঃ

- ধর্মহীন জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এবং গণতন্ত্রের উৎপত্তি
- গণতন্ত্রের তাত্ত্বিক অসারতা
- গণতন্ত্রের মাধ্যমে সৃষ্ট নতুন প্রতিমা "রাষ্ট্র" এর দর্শন
- আধুনিক বিশ্বে গণতন্ত্রের প্রায়োগিক অবস্থা

প্রথমেই বলি এই আলোচনার পরিসর অনেক বড়, সংক্ষিপ্ত পরিসরে এর সবদিক আলোচনা করা অনেক কঠিন একটি কাজ। এরপরও, এখানে এই বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক সবদিক সংক্ষেপে এখানে আলোচনা করার চেষ্টা করব; আল্লাহ যেন তৌফিক দান করেন। আমিন।

ধর্মহীন জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এবং গণতন্ত্রের উৎপত্তি

ফরাসি বিপ্লবের পরে পোপের পদমর্যাদা ও প্রভাবপ্রতিপত্তি এবং পোপদের সমর্থনপুষ্ট রাজতন্ত্র শেষ হয়ে যায়; আল্লাহর শাসনের নামে পোপ ও গির্জার ধোঁকাও শেষ হয়ে যায়। মানুষ এই বাতিল ধর্মের দাসত্ব থেকে মুক্ত হয় বটে, কিন্তু সাথে সাথে তাদের ভেতর থেকে সত্যিকার আল্লাহর শাসনের ধারণাও চলে যায়। অন্যদিকে, ফরাসি বিপ্লবের আগে মধ্য ইউরোপ জুড়ে রোমান সাম্রাজ্যের (Holy Roman Empire) দেশগুলো ত্রিশ বছর ধরে একে অন্যের সাথে যুদ্ধ করে; এই যুদ্ধের শেষে হওয়া ওয়েস্টফিলিয়া চুক্তিসমগ্রের (Peace of Westphalia) মাধ্যমে ইউরোপীয় জাতিগুলো নিজ নিজ অঞ্চলে বিভাজিত হয় এবং অঞ্চলভিত্তিক অন্ধ জাতীয়তাবাদের মূল তাদের মাঝে গেঁথে যায়। **এই চুক্তিসমগ্রের প্রভাবে পুরো ইউরোপে অঞ্চলভিত্তিক জাতীয়তা এক আক্বিদাহ বা বিশ্বাস হিসেবে প্রসিদ্ধি পায়**; ফলস্বরূপ ইউরোপে অঞ্চলভিত্তিক জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রের (Nation States) জন্ম হয়। এই নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থার ভিত্তি বানানো হয় চারটি উপাদানকে – (১) অঞ্চল, (২) জনগণ, (৩) শাসনব্যবস্থা এবং (৪) সার্বভৌমত্ব যা রাষ্ট্রকে অঞ্চল ও জনগণের উপর সর্বোচ্চ ক্ষমতা দেয়। নতুন এই রাষ্ট্রব্যবস্থার দুইটি উপাদান - ভৌগলিক অঞ্চল এবং জনগণ - তো আগে থেকে সংজ্ঞায়িত ছিল, কিন্তু শাসনব্যবস্থা এবং সার্বভৌমত্বের জায়গায় শুণ্যতা তৈরি হয়। কারণ, ফরাসি বিপ্লবের আগে এই দুইটি ছিল মূলত পোপের হাতে আর খৃষ্টানদের বিশ্বাস ছিল পোপের সব সিদ্ধান্ত আল্লাহর সিদ্ধান্ত। কিন্তু ফরাসি বিপ্লবের পরে ইউরোপের মানুষেরা আল্লাহর শাসন ও সার্বভৌমত্বকেই অস্বীকার করে বসে। এই শুণ্যতা পূরণের জন্যে এমন দর্শন ও মতবাদের দরকার ছিল যা, নাউযুবিল্লাহ, আল্লাহর মত নির্ভুল সত্ত্বার প্রতিশব্দ হয় এবং সাথে সাথে মানবতার মুক্তির অনুভূতিও দেওয়া যায়। এই শুণ্যতা পূরণ করে দার্শনিক জন লক (John Locke) এবং জান-জ্যাক রুশো (Jean-Jacques Rousseau)। জন লকের তুলনায় রুশোর দেওয়া গণতন্ত্রের দর্শন ফরাসি বিপ্লবে অনেক বেশি প্রভাব রাখে। এই দার্শনিকদের মতে মানুষের বিচারবুদ্ধি রাজনৈতিক এবং সামাজিক সব সমস্যার সমাধান করতে পারে; আল্লাহ যদি থেকেও থাকেন, নাউজুবিল্লাহ, তবুও এসব সমস্যার সমাধানের জন্য তাঁর কোন প্রয়োজন নেই, মানুষ নিজেই এসবের ক্ষমতা রাখে। এসব দার্শনিকদের আগেও খৃষ্টপূর্ব ৩০০ শতাব্দীর দিকে গ্রীক দার্শনিক প্লেটো ও অ্যারিস্টেটল এরকম কথা বলেছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে রোমান রাজারা খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করায়, রাষ্ট্রীয় শক্তির মাধ্যমে সেন্ট অগাস্টিন (Saint Augustine) এই নাস্তিক্য মতবাদকে নির্মূল করেছিলেন। কিন্তু

[7] ইবনু মাজাহ

পোপ-রাজতন্ত্র-ভূস্বামীদের সমন্বিত অত্যাচারী "এস্টেট প্রথা" এর বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া এবং ওয়েস্টফিলিয়া চুক্তিসমগ্রের ফলে সৃষ্ট অন্ধ আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদ মিলে এবার এই মতবাদ পুরো শক্তি নিয়ে ইউরোপের উপর চেপে বসে।

ফিরে আসি ফরাসি বিপ্লবের দার্শনিকদের আলোচনায় যারা মনে করত মানুষ নিজেই সব সমস্যার নির্ভুল সমাধান করার ক্ষমতা রাখে। **বলাই বাহুল্য, তাদের মতেও তো সমাজের প্রত্যেক মানুষ তো এই ক্ষমতা রাখেনা; তো শাসক শ্রেণী অন্য মানুষদের কিভাবে ধোঁকা দিয়ে নিজেদের দাস বানাল? সেটা বোঝার জন্য এখানে গণতন্ত্রের পথপ্রদর্শক রুশোর দর্শন সম্পর্কে একেবারে সংক্ষেপে আলোচনা জরুরী মনে করছি।**

গণতন্ত্রের তাত্ত্বিক অসারতা

গণতন্ত্রের পথপ্রদর্শক, রুশো, তার বিখ্যাত বই 'Social Contract' এ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার পুরোপুরি এক পরিকল্পনা উপস্থাপন করে। রুশোর মতে মানুষ এক পরিপূর্ণ স্বাধীন এবং স্বনির্ভর সত্ত্বা হিসেবে জন্ম নেয়, কিন্তু পারিপার্শ্বিকতা তাকে বন্দিত্বে আবদ্ধ করে ফেলে। রুশো Will of All অর্থাৎ সার্বজনীন আকাঙ্ক্ষা নামে একটি পরিভাষা ব্যবহার করে। স্বাধীনতা, স্বনির্ভরতা, সমাধিকার নিয়ে থাকা এবং জীবনে সুখী হওয়ার জন্য উন্নতি করা এসব আকাঙ্ক্ষা হল সার্বজনীন আকাঙ্ক্ষা। এই সার্বজনীন আকাঙ্ক্ষা ছাড়াও প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা থাকে, যাকে রুশো General Will অর্থাৎ সাধারণ আকাঙ্ক্ষা বলে অভিহিত করে। সার্বজনীন আকাঙ্ক্ষা এবং সাধারণ আকাঙ্ক্ষার মাঝে ভারসাম্য রক্ষার জন্য রুশো ব্যাপক পরিকল্পনা উপস্থাপন করে, যাকে আজকের দিনে "আধুনিক গণতন্ত্র" বলা হয়ে থাকে।

রুশোর দর্শন মোতাবেক মানুষ কোন এক সময় সুন্দর প্রাকৃতিক জীবনযাপন করত, যখন মানব বসতি অনেক কম ছিল এবং তার সার্বজনীন আকাঙ্ক্ষা পূরণ হত। ধীরে ধীরে মানব বসতি পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে, মানুষের মাঝে মালিকানা ও অন্যান্য সমস্যা শুরু হয়; যার ফলস্বরূপ সমাজে এমন এক শাসনব্যবস্থার প্রয়োজন দেখা দেয় যা মানুষের মাঝে স্বাধীনতা এবং সমতা বজায় রাখে। আবার সমাজকে টিকিয়ে রাখার জন্য এই শাসনব্যবস্থাকে এমন ক্ষমতা দেওয়া প্রয়োজন যার বিচার সিদ্ধান্ত সব মানুষ মেনে নেয়। রুশোর মতে মানুষের এমন সর্বোচ্চ বিচারকের দরকার ছিল যে সব মানুষের নিরাপত্তা, কল্যাণ, সমতা, উন্নতি এবং স্বাধীনতার মত মৌলিক অধিকারগুলো সংরক্ষণ করে। এসব মূলনীতি অনুযায়ী সামাজিক জীবন পরিচালনা করা সব মানুষের আকাঙ্ক্ষা হয়ে যায়, যাকে রুশো অভিহিত করে 'সার্বজনীন আকাঙ্ক্ষা' বা 'প্রকৃত আকাঙ্ক্ষা' (Real Will) নামে। এরপর এই আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করার জন্য এটাই দরকার ছিল যে মানুষদের মধ্য থেকে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষাকে এই মূল 'সার্বজনীন আকাঙ্ক্ষা' এর অনুসারী বানায়। এই ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষাগুলোর সমষ্টিকে রুশো অভিহিত করে 'সাধারণ আকাঙ্ক্ষা' (General Will) নামে। সহজ ভাষায় বললে সাধারণ আকাঙ্ক্ষাকে সার্বজনীন আকাঙ্ক্ষার অনুসারী করা জরুরী ছিল। **এ প্রয়োজন পূরণের জন্য মানুষ সত্যিকার নির্বাচনের মাধ্যমে নিজেদের প্রতিনিধি ঠিক করে। এই নির্বাচনের মাধ্যমে 'সাধারণ আকাঙ্ক্ষা' জনসাধারণ থেকে এসব জনপ্রতিনিধিদের মাঝে হস্তান্তরিত হয়ে যায়।** এসব জনপ্রতিনিধিরা এক সভা গঠন করে যাকে সংসদ (Parliament) বলা হয়। সংসদ এমন আইন প্রণয়ন করে যা 'সার্বজনীন আকাঙ্ক্ষা' অনুযায়ী হয়। সহজ ভাষায় 'সার্বজনীন আকাঙ্ক্ষা' এর বহিঃপ্রকাশ সংবিধানের মাধ্যমে হয় এবং 'সাধারণ আকাঙ্ক্ষা' এর বহিঃপ্রকাশ হয় সংসদের মাধ্যমে। এরপর যখন সংসদ আইন প্রণয়ন করে, তখন 'সাধারণ আকাঙ্ক্ষা' 'সার্বজনীন আকাঙ্ক্ষা' এর সামনে নিজেকে ঝুঁকিয়ে দেয়।

'সাধারণ আকাঙ্ক্ষা' যখন 'সার্বজনীন আকাঙ্ক্ষা' এর অনুসারী হয়ে এক হয়ে যায়, তখন সমাজব্যবস্থা অর্থাৎ **রাষ্ট্র সর্বোচ্চ শাসনক্ষমতা পেয়ে যায়**, এমন ক্ষমতা যা সব মানুষেরা মিলে নির্বাচন করে মেনে নিয়েছিল। **সর্বোচ্চ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর জনসাধারণের জন্য আইনের অনুসরণ এজন্য আবশ্যক হয়ে যায় যে তারা নিজেরাই এই শাসনব্যবস্থা গঠন করেছিল এবং এটা মেনে নিয়েছিল।** এভাবে মানুষের জন্য তৈরি আইনের অনুসরণের মাধ্যমে আসলে নিজেরই আনুগত্য করা হয় এবং আইন না মানলে আসলে নিজেরই অবাধ্যতা হয়। সহজ ভাষায়, মানুষ এভাবে অন্য কিছুর দাস হয়না বরং উল্টো এর মাধ্যমে সে প্রকৃত স্বাধীনতা পায়! এমন সর্বোচ্চ বিচারব্যবস্থাকে মেনে নেওয়াই মানুষকে উন্নতি, স্বাধীনতা, স্বায়ত্বশাসন এবং সমতার নিশ্চয়তা দেয়। **এটাই ঐ ফর্মুলা, যার মাধ্যমে জনপ্রতিনিধির চেহারা ধারণ করে মানুষকে ধোঁকা দিয়ে নিজেদের দাস বানিয়ে রাখা যায়।**

রুশোর এই দর্শনে এমন এক **আদর্শ সমাজের উল্লেখ আছে, যে সমাজে সামাজিক বন্ধন পুরোপুরি অটুট, সমাজে সবার আকাঙ্ক্ষা একই যার ফলে সাধারণ আকাঙ্ক্ষা হয় বিশুদ্ধ, জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হয় সর্বসম্মতিক্রমে ফলে কোন বিরোধ ও অসঙ্গতি থাকেনা।**[8] এমন আদর্শ সমাজ অর্জন করার জন্য মানুষের সামনে বাস্তব উদাহরণ হওয়া জরুরী। কিন্তু ঐতিহাসিক, চিন্তাবিদ এবং ভৌগলিকরা অনেক অনুসন্ধান করেও এমন কোন আদর্শ সমাজের অস্তিত্ব খুঁজে পাননি। **ফলে মানুষের স্বাধীনতার এই রূপরেখা পুরোপুরি কল্পনা ও স্বপ্নের জগতেই থেকে যায়।**

'রাষ্ট্র' নামের প্রতিমার দর্শন

আধুনিক রাষ্ট্রের আলোচনায় আগেই বলা হয়েছে আধুনিক রাষ্ট্রের দুইটি উপাদান - শাসনব্যবস্থা ও সার্বভৌমত্ব – এর জায়গায় ছিল শুণ্যতা; কারণ, এই দুইটি আগে অর্পিত ছিল আল্লাহর উপরে; চূড়ান্ত বিচার ও সার্বভৌমত্ব ছিল আল্লাহর হাতে। কিন্তু নতুন এই রাষ্ট্রব্যবস্থায়, এই দুইটি উপাদান রাষ্ট্রের উপর অর্পণ করা হয়। যেহেতু শাসনক্ষমতা জীবিত সত্ত্বার বৈশিষ্ট্য, এজন্য রাষ্ট্রকে শাসনব্যবস্থা ও সার্বভৌমত্ব অর্পণ করার জন্য রাষ্ট্রকে 'আইনি ব্যক্তি' (Juridical Person) হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়। অন্যান্য মুশরিকরা তো জীবিত সত্ত্বা অথবা মূর্তির পূজা করে; কিন্তু এই নতুন মুশরিকরা মানুষের মস্তিষ্ক প্রসূত, কাল্পনিক রাষ্ট্র নামের সত্ত্বার উপর শাসনব্যবস্থা ও সার্বভৌমত্ব অর্পণ করে এরই পূজা করা শুরু করে দেয় এবং রাষ্ট্রকে আল্লাহর স্থানেই বসিয়ে দেয়। এমন রাষ্ট্রকে রুশো, হেগেল এবং অন্যান্য পশ্চিমা চিন্তাবিদেরা আল্লাহ মত 'ভুলত্রুটি মুক্ত' সত্ত্বা হিসেবে ঘোষণা দেয়। **সহজ ভাষায় বললে, নতুন এই সমাজব্যবস্থায়, রাষ্ট্র মানুষের মতই ব্যক্তি কিন্তু তার স্থান সবার উপরে এবং সে সবরকম ভুলত্রুটি মুক্ত; যে এই রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত হবে সে হবে সুনাগরিক (দাস) এবং যে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ও সর্বোচ্চ শাসনক্ষমতা মানবেনা সে হবে রাষ্ট্রদ্রোহের অপরাধে অপরাধী, তার কঠিনতম শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে!** পাঠকদের কাছে প্রশ্ন রইল – তাহলে আধুনিক রাষ্ট্রের একজন সুনাগরিক রাষ্ট্র নামের সত্ত্বার কাছে চূড়ান্ত ক্ষমতা দিয়ে কিভাবে স্বাধীনতা পেল? ভণ্ড ধর্মযাজক যারা নিজেদের কথা আল্লাহর কথা বলে চালিয়ে দেয় আর রাষ্ট্রের শাসকগোষ্ঠী যারা নিজেদের সিদ্ধান্ত রাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত বলে চালায়, এই দুই দলের মাঝে কতটুকু পার্থক্য থাকল? আল্লাহর দেওয়া সমাধানকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, মানবতাকে স্বাধীনতা দেওয়ার জন্য চেষ্টারত এসব দার্শনিকদের অবস্থা কুরআন এভাবে তুলে ধরছে –

اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ

শয়তান তাদেরকে বশীভূত করে নিয়েছে, ফলে সে তাদেরকে আল্লাহর স্মরণ ভুলিয়ে দিয়েছে।[9]

আধুনিক বিশ্বে গণতন্ত্রের প্রায়োগিক অবস্থা

বর্তমান সময়ে এটা উল্লেখই করা হয় এবং এটা সবাই মানতে বাধ্য যে, গণতন্ত্র হল সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন। কথাটা অন্যভাবে বললে সংখ্যালঘিষ্ঠরা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠের দাস। সম্মানিত পাঠকবৃন্দ, এখন আপনাদের সামনে যে সত্যটা তুলে ধরতে চাই সেটা হল **গণতন্ত্র সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনও নয়, এটা আসলে বৈশ্বিক শাসনব্যবস্থার বাছাইকৃত ব্যক্তিদের শাসন যেখানে এই বাছাইকৃত ব্যক্তিদের 'সংখ্যাগরিষ্ঠের জনপ্রতিনিধি' হিসেবে দেখান হয়।**

ফরাসি বিপ্লব থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত সময়টাতে ইউরোপের দেশগুলো হত্যাযজ্ঞ ও লুণ্ঠনের পর লুণ্ঠনের মাধ্যমে সারা দুনিয়াতে তাদের ঔপনিবেশিক শাসন কায়েম রাখে। এই সময়ে উপনিবেশগুলোতে তারা নিজেদের বানানো শিক্ষা ও শাসনব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠা করে; সাথে সাথে স্থানীয় শিক্ষা ও শাসনব্যবস্থাকে শিকড় থেকে উপড়ে দেয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে উসমানী খিলাফতকে ধ্বংস করার মাধ্যমে পৃথিবী থেকে ধর্মভিত্তিক শাসনব্যবস্থাকে শেষ করে দেওয়া হয় এবং সারা বিশ্বে ইউরোপের মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জাতিসংঘ ও এর নিরাপত্তা পরিষদের মাধ্যমে পাঁচ পরাশক্তি পৃথিবীকে শাসন শুরু করে। পরাশক্তিগুলো তাদের অনুগত দেশগুলোকে দুইটি শক্তি দিয়ে শাসন করে – পারমাণবিক অস্ত্রসহ তাদের অতিকায় সামরিক শক্তি এবং মানুষের মগজে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বকে বসিয়ে দেওয়ার জন্য প্রতারণাপূর্ণ মিডিয়া। এই প্রতারণাপূর্ণ মিডিয়াগুলোই এই

[8] *The Social Contract*, Book IV, paragraph 4

[9] সূরা আল মুজাদিলাহঃ ১৯

পরাশক্তিদের পছন্দের পাত্রদেরকে জনগণের সামনে নায়ক বানায়; এদের জন্য প্রচারণা চালায় এবং ভোটের সময় এদেরকে সামনে নিয়ে আসে। অন্য কোন মানুষ যতই প্রতিভাধর হোক না কেন, পরাশক্তিদের সমর্থন না পেলে সে জনসাধারণের সামনে ভোটের জন্য দাঁড়াতেই পারেনা। এরই ফলস্বরূপ আমরা দেখতে পাই, অনিচ্ছা সত্ত্বেও, গণতন্ত্রের নামে মানুষকে হাসিনা অথবা খালেদার মাঝেই নিজেদের পছন্দকে সীমাবদ্ধ রাখতে হয়। ধনকুবের ডোলাল্ড ট্রাম্প নিজের অর্থ ও ব্যবসার জোরে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হয়ে যায়; **সারা দুনিয়ায় গণতন্ত্রের বিক্রেতা আমেরিকার জনগণও রাস্তায় নেমে স্লোগান দিতে থাকে "Not my president" অর্থাৎ "সে আমার প্রেসিডেন্ট নয়"**।

আবার, যদি কখনও ভোটের মাধ্যমে বৈশ্বিক শাসনব্যবস্থার কাছে অপছন্দীয় কোন পাত্র কোন দেশের ক্ষমতায় চলে আসে, তখন অর্থনৈতিক অবরোধ, বিক্ষোভ-সমাবেশের নাটক, সামরিক অভ্যুত্থান বা আগ্রাসন এরকম সম্ভব সব পন্থা ব্যবহার করে তাকে সরানোকে তারা অন্যায় কিছু মনে করেনা। এর প্রকৃষ্ট কিছু উদাহরণ হলঃ মিসরে মুরসি সরকারের পতন, হামাস কর্তৃক ফাতাহর কাছে গাযার ক্ষমতা সমর্পণ অথবা ১৯৯২ সালে আলজেরিয়ায় সামরিক অভ্যুত্থান। অপছন্দীয় এই ব্যক্তিকে ক্ষমতা থেকে অপসারণের পর, নতুন পুতুল সরকার ক্ষমতায় আসলে পরাশক্তি ও পরাশক্তির অন্য দেশের গোলামরা এই নতুন গোলামকে সব রকম সহযোগিতা দিয়ে টিকিয়ে রাখে। এভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠের পছন্দের মাধ্যমে নয় বরং সংখ্যাগরিষ্ঠের পছন্দকে ধোঁকা দিয়ে অথবা বলপ্রয়োগ করে জনপ্রতিনিধি বানানো হয়।

মুক্তিযুদ্ধের কপট চেতনার দাবিদারদের দ্বিমুখীতা

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ, এখানে আপনাদের সামনে যেটা তুলে ধরতে চাই, সেটা হল - **তথাকথিত মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ধারক ও বাহকদের স্ববিরোধী অবস্থানগুলো এবং এটাও দেখাব তারা নিজেরাই নিজেদের দাবিতে কতটা মিথ্যাবাদী**। আসলে সারা দুনিয়াতেই এই শ্রেণীর মানুষগুলো – হোক সে বাঙালি, ভারতীয়, বার্মিজ, রাশিয়ান অথবা আমেরিকান – একই রকম। শয়তান এদের মোহ আবিষ্ট করে রেখেছে এবং তাদেরকে তাদের জুলম, তাদের স্ববিরোধী অবস্থানগুলো সুন্দর করে দেখাচ্ছে। এরা একে অন্যকে কারুকচিত নামে ডেকে ভুলিয়ে রাখছে। যার ফলে আমরা দিনের আলোর মত সুস্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছি – মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ঘোর বিরোধীরা নিজেদের বলছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ধারক ও বাহক, প্রাচীন গ্রিক দেবীর মূর্তি সুপ্রিমকোর্টে স্থাপন করাকে বলা হচ্ছে আধুনিকতা, বাংলাদেশের ডাইনীকে বলা হচ্ছে গণতন্ত্রের মানসকন্যা, আফগানিস্তানে গণহত্যার পরেও শান্তিতে নোবেল বিজয়ী হয় সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট, আরাকানে গণহত্যা করার পরও শান্তিতে নোবেল বিজয়ীর নোবেল ফিরিয়ে নেওয়া হয়না, সারা দুনিয়ায় সবচেয়ে বেশি ড্রোন মিসাইলের বর্ষণ ও ক্ষমতার পুরোটা সময় যুদ্ধের পরও শান্তিতে নোবেল বিজয়ী আমেরিকান প্রেসিডেন্ট হয় "শান্তিকামী"। কুরআন আল্লাহর বাণী, আর আল্লাহর চেয়ে সত্যবাদী আর কে হতে পারে? এদের কথা কুরআন বলছে এভাবে –

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا

এমনিভাবে আমি প্রত্যেক নবীর জন্যে শত্রু করেছি শয়তান, মানব ও জিনকে। তারা ধোঁকা দেয়ার জন্যে একে অপরকে কারুকার্যখচিত কথাবার্তা দিয়ে প্রেরণা দেয়।[10]

ভারত ও এর গোলামদের বর্তমান অবস্থা

মুক্তিযুদ্ধের চেতনার এই ধারকেরা অনেকেই তাদের কথাই বলে "ভারতের ঋণ আমরা এখনও শোধ করতে পারিনি", "ভারত আমাদের যে উপকার করেছে তা অতুলনীয়", "ইন্দিরা গান্ধী লাখ লাখ বাঙালি উদ্বাস্তুদের জন্য যে পদক্ষেপ নিয়েছিলেন তার জন্য বাঙালিদের তার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা উচিত"। তো তাদের এই মুক্তিদাতা বিগত পঞ্চাশ বছরে বাংলাদেশের নদনদীগুলোতে কেন পানির ন্যায্য হিসাব দিচ্ছেনা অথবা কেন সীমান্তে নিরস্ত্র বাংলাদেশিদের নির্বিচারে হত্যা করা বন্ধ করলনা? সত্তর বছর পার হয়ে যাওয়ার পরও কেন কাশ্মীরে কোন গণভোটের আয়োজন করলনা? গত পনের বছরে কেন একটি বারের জন্যও বার্মিজ সরকারের রোহিঙ্গা নিধনের কোন মৌখিক প্রতিবাদও করলনা? বাঙালিদের মত রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুদের থাকার কোন জায়গা কেন দিলনা? বরং জীবন বাঁচানোর জন্য যেসব রোহিঙ্গা বার্মা থেকে ভারতে আশ্রয়

[10] সূরা আন'আমঃ ১১২

নিতে গেছে, ভারতের সুপ্রিম কোর্ট তাদেরকে ভারতের নিরাপত্তার জন্য হুমকি বলে রায় দিয়েছে, তাদের বার্মায় ফেরত পাঠানোর আইনি প্রক্রিয়া চালাচ্ছে। এসব দেখে কি এটা পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়না যে, চিরশত্রু পাকিস্তানকে ভেঙে বাংলাদেশকে নিজেদের দাস বানানোর পরিকল্পনা থেকেই ভারত ১৯৭১ সালে বাঙালিদের আশ্রয় ও মুক্তিযুদ্ধে সাহায্য করেছিল; বাংলাদেশের মানুষকে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর অত্যাচার নির্যাতন থেকে মুক্ত করা এর আসল কোন এজেন্ডা ছিলনা?

ভারতের বাঙালি গোলামদের অবস্থা দেখুন! তারা সব সময় ভারতের জয়গানে ব্যস্ত; ইসলাম বিদ্বেষের চেতনাকে তারা নাম দিয়েছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা; যার ফলে মেয়েরা বোরকা পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসলে তাদের কাছে মনে হয় এটা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধী কর্মকাণ্ড। সত্যিকার মুক্তিযুদ্ধের চেতনা যদি থাকত তাহলে তারা কাশ্মীরে ভারতের রক্তক্ষয়ী জুলম অথবা ভারতের সিকিম দখল নিয়ে প্রতিবাদ করত; সত্যিকার মানবতা যদি থাকত, তাহলে ভারতে গরু জবাই তো দূরের কথা গরু কেনাবেচার জন্য মুসলমানদের পিটিয়ে মারার প্রতিবাদ করত; কিন্তু এসব বিষয়ে এরা একেবারে নিশ্চুপ। **তারা যদি কিছু বলেও থাকে উল্টো কাশ্মীরের ব্যাপারে ভারতের সাফাই গাবে; তাদের কলম থেকে লেখা বের হবে – "*কাশ্মিরের আকাশে মৌলবাদের কালমেঘ*", "*দক্ষিণ এশিয়ায় মৌলবাদ*"।**

এরই ধারাবাহিকতায় যখন আরাকানে এত অত্যাচার, নির্যাতন, হত্যা-ধর্ষণের পরও সারা বিশ্ব নিরব দর্শক হয়ে থাকল, এরপর রোহিঙ্গারা নিজেদের বাঁচানোর জন্য বাঙালি মুক্তিযোদ্ধাদের মত ২০১৬ সাল থেকে সশস্ত্র প্রতিরোধ শুরু করল, তখন **এই গোলাম ও পুতুলের দল কি করল? তারা আরাকান সমস্যার "স্থায়ী সমাধান" এর জন্য কোথায় এই রোহিঙ্গা মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করবে বা কমপক্ষে তাদের দাবিগুলোর পক্ষে কথা বলবে, তা নয়, উল্টা বার্মিজ সেনাবাহিনীর সাথে মিলে রোহিঙ্গা মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে যৌথ অভিযানের প্রস্তাব দিচ্ছে।** বার্মা সরকার এই প্রস্তাবে কর্ণপাত না করায় তারা উদ্বিগ্ন। তারা আশায় আছে বার্মা সরকারের "সুমতি" হবে, তারা তাদের এই প্রস্তাব মেনে নিবে। এই হল কপটতায় পরিপূর্ণ মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসীদের অবস্থা। **তারা যদি তাদের সংজ্ঞা অনুযায়ী মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় অকপট হত, তাহলে কমপক্ষে আরাকানি এই মুক্তিযোদ্ধাদের ন্যায্য দাবিগুলো মেনে নেওয়ার জন্য বার্মা সরকারকে চাপ দিত এবং বলতে পারত বার্মা সরকারের "সুমতি" হলে তারা এই দাবিগুলো মেনে নিবে। কিন্তু তারা এটা না করে বরং করল সম্পূর্ণ বিপরীত আচরণ। এমনকি এসব রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুদের এরা শরণার্থী হিসেবে মেনে নিতেও রাজি নয়; এসব উদ্বাস্তুদের এরা নাম দিয়েছে "বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের নাগরিক"।** এদের স্ববিরোধী আচরণকে তুলে ধরার জন্য ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা-পূর্ব বাংলাদেশ তথা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান এবং বর্তমান আরাকানের এক তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

১৯৭১ সালের বাংলাদেশ এবং বর্তমান আরাকানের এক তুলনামূলক আলোচনা

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হয় ভৌগলিকভাবে বিচ্ছিন্ন পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) ও পশ্চিম পাকিস্তান নিয়ে। দীর্ঘ ২৪ বছর ধরে বাঙালিদের উপর চলে সেনাবাহিনী নিয়ন্ত্রিত পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠীর বৈষম্যমূলক শাসন। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ পাকিস্তান থেকে আলাদা হয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ২৬ শে মার্চ থেকে শুরু হয়ে ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রায় নয় মাস চলে স্বাধীনতা যুদ্ধ। যুদ্ধের শুরু হয় ২৫শে মার্চ রাতের ভয়ানক গণহত্যা দিয়ে। পুরো নয় মাস ধরে চলে গণহত্যা, ধর্ষণ, লুণ্ঠন। গণহত্যা থেকে বাঁচতে প্রায় ১ কোটি বাঙালি উদ্বাস্তু হয়ে চলে যায় ভারতে। ভারত নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য শুধু বাঙালি মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্যই করেনা বরং মুক্তিযোদ্ধাদের নেতৃত্ব নিয়ে নেয়। ইন্দিরা গান্ধীর অজুহাত ছিল এত বিপুল সংখ্যক উদ্বাস্তুর বোঝা ভারত নিতে পারবেনা; এর চেয়ে বরং পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাই হল সহজ সমাধান।[11]

এবার আসি আরাকান প্রসঙ্গে। **আরাকান বার্মার মূল ভূখণ্ড থেকে আরাকান পর্বতমালার কারণে ভৌগলিকভাবে বিচ্ছিন্ন। এটা ঐতিহাসিকভাবে ও ভৌগলিকভাবে বাংলাদেশের চট্টগ্রামের সাথেই বেশি সংশ্লিষ্ট।** ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দের আগে এই ভূখণ্ড কখনই বার্মার মূল ভূখণ্ডের অধীন ছিলনা; বরং অনেক লম্বা সময় চট্টগ্রাম ও আরাকানের মাঝে কোন রাজনৈতিক সীমানাই ছিলনা। **ফলে বাংলা থেকে আরাকান বা আরাকান থেকে বাংলায় এসে বসবাসে মুসলিম বা অমুসলিম কারও জন্য কোন বাঁধা ছিলনা।**

[11] "Indo-Pakistani Wars" MSN Encarta ২০০৯ সালের ৩১শে অক্টোবর আর্কাইভ করা ভার্সন থেকে সংগৃহীত

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৮২৬ সালে বার্মার কাছ থেকে আরাকান প্রদেশ দখল করে এবং আরাকানকে বাংলা প্রদেশের সাথে মিলিয়ে শাসন করে। ১৮৮৬ সালে সমগ্র বার্মা ব্রিটিশদের অধীনে আসে। কালক্রমে বার্মাকে আলাদা প্রদেশ বানানো হয় এবং আরাকানকে বার্মার সাথে মিলিয়ে দিয়ে, বাংলা থেকে আলাদা করে দেওয়া হয়। ১৯৩৭ সালে বার্মাকে আলাদা উপনিবেশ ঘোষণা করে ঐতিহাসিক বন্ধন থাকা সত্ত্বেও আরাকানকে বাংলা থেকে পুরোপুরি আলাদা করে দেওয়া হয়। ফলে, যথাক্রমে ১৯৪৭ ও ১৯৪৮ সালে যখন পাকিস্তান ও বার্মা দুইটি আলাদা রাষ্ট্র জন্ম নেয়, আরাকান স্থায়ীভাবে বাংলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠার সময় আরাকানের মুসলিম নেতারা আরাকানকে পাকিস্তান অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশের সাথে যুক্ত করার দাবি জানালেও, মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহ তাদের এই অনুরোধকে উপেক্ষা করেন।

যখনই আরাকান বার্মা সরকারের অধীনে ছিল (১৭৮৫-১৮২৬ এবং ১৯৪৮-এখন পর্যন্ত) তখনই আরাকানের মুসলিমদের উপর চলে অত্যাচার নির্যাতন। ১৯৭৮ সালে Operation King Dragon এর সময় অনেক রোহিঙ্গা আরাকান ছেড়ে বাংলাদেশের বৃহত্তর চট্টগ্রাম ও পাকিস্তানের করাচীতে যেয়ে আশ্রয় নেয়। ২০১২ সাল থেকে যখন আরাকানে আবার ভয়াবহ আকারে রোহিঙ্গাদের উপর গণহত্যা, ধর্ষণ, বসত-ভিটায় অগ্নিসংযোগের ঘটনা শুরু হয়, তখন থেকে অনেক বড় সংখ্যায় রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু আরাকান থেকে পালাতে থাকে। এই উদ্বাস্তুদের অনেকেই পালাতে যেয়ে নৌকাডুবিতে অথবা মানব পাচারকারী গোষ্ঠীর নিষ্ঠুরতার শিকার হয়ে মারা যায়।

গত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশক থেকেই বার্মিজ সেনাবাহিনীর এই নৃশংসতার বিরুদ্ধে রোহিঙ্গারা প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু করে; এই আন্দোলন নব্বই দশক পর্যন্ত জারি থাকলেও বিগত এক দশকে তা একেবারেই স্তিমিত হয়ে পড়েছিল। **২০১৬ সালের অক্টোবর মাসে মুক্তিকামী কিছু রোহিঙ্গা ঘরের দা-কুড়াল, তীর-ধনুক নিয়েই বার্মিজ সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে আবার প্রতিরোধ আন্দোলনে নেমে পড়ে এবং নিজেদের নূন্যতম অধিকার আদায়ের জন্য সাত দফা দাবি পেশ করে।**[12] **এইগুলো এমন সব দাবি, যেগুলো ধর্ম নির্বিশেষে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য এবং এগুলো আধুনিক মানবাধিকারের সংজ্ঞার সঙ্গে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাদের দাবি ছিল আরাকান রাজ্যে আন্তর্জাতিক তদন্ত ও হস্তক্ষেপের, যাতে করে সেখানে নির্বিচার গণহত্যা বন্ধ হয়** (পাঠকরা হয়ত জেনে থাকবেন আরাকান রাজ্যে রোহিঙ্গা অধ্যুষিত এলাকায় এমনকি সাংবাদিকদেরও প্রবেশাধিকার নেই)। কিন্তু তাদের এই দাবিগুলোর প্রতি বার্মা সরকার বিন্দুমাত্র কর্ণপাত করেনি, বরং তারা তাদের পুরনো বর্ণবাদী "জাতিশুদ্ধি" অভিযান চালিয়ে যায়। তাদের এই আগ্রাসনের ফলশ্রুতিতে শুধু ২০১৭ সালের আগস্ট থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময়ের মাঝেই জাতিসংঘের উদ্বাস্তু বিষয়ক সংস্থা, UNHCR, এর হিসাব অনুযায়ী পাঁচ লাখেরও বেশি রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু বাংলাদেশে আসে, যদিও প্রকৃত সংখ্যা এর থেকে অনেক বেশি এবং প্রতিদিনই এই সংখ্যা বেড়েই চলেছে। পুরনো ও নতুন সব মিলিয়ে, শুধু বাংলাদেশেই এখন রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুদের সংখ্যা দশ লাখেরও বেশি।

তো কপট মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ধারক বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন দল এই সাত দফা দাবি বা এত উদ্বাস্তুদের জন্য স্থায়ী কি সমাধান খুঁজে পেল? **তাদের কপটতার কারণে, বৈশ্বিক কুফরি শাসনব্যবস্থাকে খুশি করা এবং ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য যে সমাধান এই সরকার পেল তা হল - বার্মিজ সেনাবাহিনীর সাথে মিলে আরাকানি মুক্তিবাহিনীর উপর যৌথ অভিযান!!!**

---

[12] পাঠকদের অবহতির জন্য দাবিগুলো এখানে উল্লেখ করা জরুরী মনে করছি –

I. রোহিঙ্গা মানবগোষ্ঠীকে মিয়ানমারের নাগরিকত্ব দেওয়ার সাথে সাথে তাদের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া এবং শর্তহীনভাবে তাদের ঐতিহাসিক গোষ্ঠীয় পরিচিতিকে "রোহিঙ্গা" হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া।

II. রোহিঙ্গা জনসাধারণকে IDP ক্যাম্প থেকে ছেড়ে দেওয়া এবং তাদেরকে আরাকানে তাদের পৈত্রিক বসতভিটায় ফিরিয়ে নিয়ে আসা। তাদের ধ্বংস হয়ে যাওয়া ঘরবাড়িগুলো সরকারি খরচে নির্মাণ করে দেওয়া।

III. রোহিঙ্গাদের স্থাবর ও অস্থাবর যেসব সম্পত্তি অবৈধভাবে বাংলাদেশি রাখাইনদের - যারা বর্তমানে আরাকানে প্রতিষ্ঠিত - দেওয়া হয়েছে, সেগুলো সরকারি ব্যবস্থাপনায় রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে দেওয়া।

IV. ১৯৮২ সালে প্রণীত নাগরিকত্ব আইন বাতিল করা অথবা আন্তর্জাতিক তত্ত্বাবধায়নে মায়ানমারের সব নাগরিকদের উপর একই নাগরিকত্ব আইন প্রয়োগ করা।

V. সূচির নেতৃত্বাধীন মিয়ানমারের গণতান্ত্রিক সরকার কর্তৃক IDP ক্যাম্পে বন্দীদের ক্ষতিপূরণ হিসেবে তাদের ধ্বংস হয়ে যাওয়া ঘরবাড়ি এবং উপাসনালয় পুনঃনির্মাণ করা এবং সাথে সাথে তাদের কাছে ক্ষমা চাওয়া।

VI. মিয়ানমারের অন্য সব জাতিগোষ্ঠীর উপর সব ধরণের আগ্রাসন বন্ধ করা।

VII. সব ধরণের ধর্মীয় অত্যাচার নিপীড়নের প্রতিরোধ করা এবং যেসব বৌদ্ধ চরমপন্থী শান্তিকামী মিয়ানমারের নাগরিকদের মাঝে ঘৃণা ছড়াচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া।

উদ্বাস্তুদের দায়িত্ব এড়ানোর জন্য সমাধান হল তাদের "বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের নাগরিক" হিসেবে আখ্যা দেওয়া, যদিও এরা ভাল করেই জানে যে, এই উদ্বাস্তুদের মিয়ানমার নাগরিক হিসেবেই স্বীকৃতি দেয়না।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার বর্তমান চিত্র

এই আলোচনা শেষ করার আগে মুক্তিযুদ্ধের কপট চেতনার ধারকদের চরিত্রকে পাঠকদের সামনে আরও সুস্পষ্টভাবে দেখানোর জন্য বাংলাদেশের স্বাধীনতার বর্তমান চিত্র কিছুটা তুলে ধরার প্রয়োজন অনুভব করছি।

বাংলাদেশে বর্তমান ক্ষমতাসীন দল, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, সব সময় বাঙালি জাতিকে - মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষ ও বিপক্ষ শক্তির নামে – বিভক্ত করে বাঙালি জাতিকে ধোঁকা দিয়ে শাসন করতে চায়। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আগের মেয়াদে যখন ক্ষমতায় ছিল, তখন ঐ সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিল মহিউদ্দীন খান আলমগীর। ১৯৭১ সালে যখন বাংলাদেশে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী গণহত্যায় ব্যস্ত, তখন এই ব্যক্তি ছিল পাকিস্তান সরকারের পক্ষ থেকে ময়মনসিংহের ডেপুটি কমিশনার। ১৯৭১ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে বৃহত্তর ময়মনসিংহে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করা **বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী** খোলাখুলিভাবে এই ব্যক্তিকে মহা-রাজাকার বলেন। তিনি বলেন, এই সরকারের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল (International Crimes Tribunal) এর নামে **রাজাকারদের বিচারকার্য কপটতায় পরিপূর্ণ; সাথে সাথে তিনি এটাও উল্লেখ করেন, "বর্তমান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পাকিস্তান সরকারের একজন অফিসার ছিল। মুক্তিযুদ্ধের সময় ... ডক্টর মহিউদ্দীন খান আলমগীরের সহায়তায় পাকিস্তানী সেনাবাহিনী গণহত্যা চালায়"**।[13]

এই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সময়েই রাসূল (ﷺ) এর অবমাননার শাস্তি দাবি করায় এক রাতেই হাজারের বেশি রাসূলের প্রেমিককে জীবন দিতে হয়। রাজধানী ঢাকার একেবারে কেন্দ্রে এই ঘটনা ঘটলেও, সংবাদমাধ্যমে এর কোন সঠিক তথ্য পাওয়া যায়নি। সেই রাতে এই ঘটনা সরাসরি সম্প্রচার করার সময়, সরকার কোন কারণ না দেখিয়েই দুইটি টিভি চ্যানেলের – দিগন্ত টেলিভিশন এবং ইসলামিক টিভি – সম্প্রচার বন্ধ করে দেয়।[14] অনেক সাংবাদিক ও ক্যামেরাম্যানকে ঘটনাস্থলে মারধর করা হয়। নিহতের সংখ্যা মাত্র ৬১ বলার পরও মানবাধিকার সংস্থা 'অধিকার' এর সাধারণ সচিব আদিলুর রহমান খানকে গ্রেপ্তার করে এক বছরেরও বেশি সময় আটক করে রাখা হয়।[15]

স্বাধীনতার স্বপক্ষশক্তি বলে নিজেদের অভিহিত করা, বর্তমান **বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনের আগে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিকে দমন করার জন্য ২০১৩ সালের ১৫ই ডিসেম্বর ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনীকে (BSF) বাংলাদেশের সাতক্ষিরা জেলায় নিয়ে আসে। আধুনিক রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব নষ্ট করে এই বাহিনী বাংলাদেশে প্রবেশ করে এবং রাষ্ট্রীয় পুলিশ ও আধা-সামরিক বাহিনীর সাথে মিলে নিরস্ত্র জনগণের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে; পঞ্চাশের বেশি গ্রামবাসীকে হত্যা করে এবং ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়।**[16] সরকার সফলভাবে এই ঘটনা ধামাচাপা দিয়ে দেয়। বড় সংবাদপত্রগুলোর মাঝে শুধু "দৈনিক ইনকিলাব" এই খবরটি এই শিরোনামে ছাপিয়েছিল – 'সাতক্ষীরায় যৌথবাহিনীর অপারেশনে ভারতীয় বাহিনীর সহায়তা'[17]; কিন্তু তাৎক্ষণিক ভাবে ইনকিলাবের প্রকাশনা বন্ধ করে দেওয়া হয়। এরপর, সংবাদপত্রটির পরিচালকেরা সরকারের কাছে এরকম খবর প্রকাশ করার জন্য "ক্ষমা" চাইলে, সরকার আবার এর প্রকাশনার অনুমতি দেয়।[18]

২০১৪ সালের ৫ই জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হয় একদলীয় নির্বাচন। ৫০% এর বেশি আসনে কোন নির্বাচন না হলেও বৈশ্বিক শাসনব্যবস্থা এই সরকারকে জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। রাষ্ট্রের প্রচলিত আইনে তো এই সরকারের বিরোধীদের দমন চলছেই, সাথে সাথে চলছে সেক্যুলারদের ভাষাতেই অবৈধ প্রক্রিয়ায় হত্যা গুম। ২০১০ সাল থেকে এই

---

[13] *মহিউদ্দিন খান মহা-রাজাকার ; কাদের সিদ্দিকী*। দৈনিক নয়া দিগন্ত, মার্চ ১, ২০১৩।

[14] *"Riot police battle Islamists in Dhaka Bangladesh"*. BBC News. সংগ্রহের তারিখ ২১শে মে, ২০১৩।

[15] *"Detention of Bangladeshi Human Rights Activist Adilur Rahman Khan"*. Marie Harf (August 12, 2013), US Department of State.

[16] সবচেয়ে প্রথমে এই ঘটনার গোপন নথিপত্র বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার ফেসবুক পেজে প্রকাশিত হয়। এরপরে এই ফ্যাক্স বার্তাগুলো অন্যান্য ফেসবুক পেজে এবং অনলাইন নিউজ পোর্টালে ছড়িয়ে পড়ে। যেমন - http://www.amader-somoy.com/content/2014/01/15/middle0056.htm।

[17] http://www.dailyinqilab.com/2014/01/16/154825.php

[18] http://www.bbc.com/bengali/mobile/news/2014/01/140116_an_inquilab_police_raid.shtml

গুম ও অপহরণ নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে গেছে; এমনকি প্রাক্তন সংসদ সদস্যরাও এ থেকে রেহাই পাচ্ছেনা। সিলেট থেকে নির্বাচিত **প্রাক্তন সংসদ সদস্য ইলিয়াস আলীর গুম** হয়ে যাওয়া এর একটি উদাহরণ।[19]

কোন সাহসী সাংবাদিক যদি অকপটভাবে কোন খবর মানুষের কাছে দিতে চাচ্ছে তো তার উপরও আইনি ও বেআইনী দুই প্রক্রিয়াতেই দমন নিপীড়ন চলছে। **সাংবাদিক দম্পতি সাগর-রুনিকে হত্যা,** সাংবাদিক মাহমুদুর রহমানকে গ্রেপ্তার ও লাগাতার রিমান্ড, **বাংলাদেশ ব্যাংকের ৯৬১ মিলিয়ন ডলার চুরির বিষয়ে কথা বলায় তথ্যপ্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ তানভির হাসান যোহাকে অপহরণ,** আশির উপর বয়সের সেক্যুলার সাংবাদিক শফিক রেহমানকে গ্রেপ্তার-হয়রানি, কলামিস্ট ও মানবাধিকার কর্মী ফরহাদ মজহারকে অপহরণ ... দিনে দিনে এই তালিকা শুধু বাড়ছেই; আর অন্যদিকে চলছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার জয়গান। **৫৭ ধারা এবং এরপরে ৫৭ ধারা থেকে বিবর্তিত ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন একদলীয় সংসদে পাশ করে যে কোন সাংবাদিককে এই ধারায় গ্রেপ্তারের বন্দোবস্ত করা হয়েছে।** ফলে ইসলামবিরোধী, সেক্যুলার, এমনকি সরকারের পক্ষের সাংবাদিকরাও ভয়ে এই আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমেছে।

ক্ষমতাসীন দল বিচারব্যবস্থাকে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য নিজেদের পছন্দের মানুষদের বিচারক বানিয়েও স্বস্তি পাচ্ছেনা, বিচারপতিদেরকে অভিশংসনের ক্ষমতাও একদলীয় সংসদের কাছে রাখতে চাচ্ছে। **ক্ষমতাসীনদের অনুগত হওয়া সত্ত্বেও, বাংলাদেশের প্রথম হিন্দু প্রধান বিচারপতি এটা মেনে নিতে পারেনি;[20] ফলে আইনবিভাগ ও বিচারবিভাগ আজ মুখোমুখি।**

প্রবন্ধ দীর্ঘ হয়ে যাবে, তাই কপটতা ও দ্বিমুখীতার এই তালিকা আর বড় করছিনা। পাঠকরা নিজেরাই এগুলো স্মরণ করে নিতে পারবেন।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত হন, দুনিয়া ও আখিরাতকে বাঁচান

সত্যিকার মুক্তিযুদ্ধ কি এবং সারা দুনিয়ায় এখন কিভাবে মানবতার মুক্তির নাম দিয়ে মানবতাকে দাসত্বে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে তা আশা করি এখন দৃষ্টিসম্পন্ন সবার সামনে সুস্পষ্ট। সত্যিকার মুক্তিযুদ্ধের চেতনা হল মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত করার জন্য যুদ্ধ অর্থাৎ জিহাদের চেতনা; আর এই চেতনা ছাড়া কেউ পরিপূর্ণ মুমিন হতে পারেনা। এজন্যই আমাদের প্রিয় নবী (ﷺ) বলেনঃ

مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُوَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ

যে এমন অবস্থায় মারা গেল যে **সে কোন সামরিক অভিযানে যায়নি অথবা কোন অভিযানে যাওয়ার ইচ্ছাও** করেনি, তার মৃত্যু নিফাকির (কপটতার) কোন শাখায় মৃত্যু।[21]

সত্যিকার মুক্তিযুদ্ধ অর্থাৎ আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের চেতনার গুরুত্ব যে কত বেশি তা কুরআন মাজিদ পড়লেই বোঝা যায়। দুনিয়া ও আখিরাতের মুক্তি যে এই জিহাদে, তা স্মরণ করানোর জন্য নিচের আয়াতগুলো উল্লেখ করে এই আলোচনা এখানেই শেষ করছি। আল্লাহ বলেনঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ [١٠] تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ [١١] يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ [١٢] وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا ۖ نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ[١٣]

হে মুমিনগণ, আমি কি তোমাদেরকে এমন এক ব্যবসার সন্ধান দিব, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি দেবে? তা এই যে, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আল্লাহর পথে নিজেদের ধন-সম্পদ ও জীবন দিয়ে জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্যে উত্তম; যদি তোমরা বোঝ। তিনি তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করবেন

---

19 *"Strike turns violent in Bangladeshi town of Sylhet".* BBC News. 23 April 2012।

20 *"ষোড়শ সংশোধনী অবৈধঃ হাইকোর্ট"।* প্রথম আলো। সংগৃহীত ৭ই মে ২০১৬।

21 সহিহ মুসলিম

এবং তোমাদের প্রবেশ করাবেন এমন জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; তিনি আরও প্রবেশ করাবেন জান্নাতের স্থায়ী নিবাসস্থলের উত্তম বাসগৃহে। এটা মহাসাফল্য। তিনি আরও একটি অনুগ্রহ দিবেন, যা তোমরা পছন্দ কর। আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য এবং আসন্ন বিজয়। মুমিনদেরকে এর সুসংবাদ দান করুন।[22]

এই আয়াতগুলো থেকে যে শিক্ষা পাওয়া যায়ঃ

- যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহ আমাদের **একটি ব্যবসার খবর দিচ্ছেন; যেই ব্যবসার দুইটি অংশ – ঈমান আনা ও জান-মাল দিয়ে জিহাদ**। এই দুইটি বিষয় মিলেই এই ব্যবসা; শুধু ঈমান আনলে এই ব্যবসা পূর্ণ হয়না।
- এই ব্যবসার আখিরাতে প্রতিদান আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা ও জান্নাত।
- দুনিয়াতে প্রতিদান আল্লাহর সাহায্য ও আসন্ন বিজয়।

মুক্তিযুদ্ধের কপট চেতনার ধারকদের প্রতি আহবান

মুক্তিযুদ্ধের কপট চেতনার ধারক ও বাহক এবং তাদের অন্ধ অনুসারীদের প্রতি আমাদের আহবানঃ সময় থাকতে অন্তর দিয়ে আমাদের কথাগুলো বিবেচনা করুন, চোখ খুলে দেখুন। নিজেদের কপটতা ও দ্বিমুখীতা একবার দেখে নিন, মৃত্যু আশার আগেই নিজেদের সংশোধন করে নিন। আপনাদের সাথে আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের পার্থিব কোন কারণে কোন শত্রুতা নেই; **আমরা কোন রক্তপিপাসু নই, আমরা কোন নেশাগ্রস্ত নই অথবা ক্ষমতার লোভে মানুষকে নিজেদের গোলামও বানাতে চাইনা। আমরা আপনারাসহ সকল মানুষকে মুক্তি দিতে চাই; সবাইকে চিরঞ্জীব, শাশ্বত আল্লাহর বিধানের অধীন করে সমাজকে পরিশুদ্ধ করতে চাই, ন্যায়পরায়ণ সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চাই**। আপনারা নিজেদেরকে তাদের মত বানাবেননা, যাদের বর্ণনা স্বয়ং আল্লাহ এভাবে দিচ্ছেন –

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ۖ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ

আর আমি সৃষ্টি করেছি জাহান্নামের জন্য বহু জ্বিন ও মানুষ। তাদের অন্তর রয়েছে কিন্তু তার দ্বারা তারা বিবেচনা করে না, তাদের চোখ রয়েছে কিন্তু তার দ্বারা তারা দেখে না, আর তাদের কান রয়েছে কিন্তু তার দ্বারা তারা শোনে না। তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত; বরং তাদের চেয়েও নিকৃষ্টতর। তারাই হল অমনোযোগী, শৈথিল্যপরায়ণ।[23]

বর্তমান যুগে শরীয়তী শাসনব্যবস্থার স্বরূপ

পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, শরীয়তভিত্তিক শাসনব্যবস্থায় মানুষের প্রকৃত মুক্তি নিহিত। কিন্তু, সারা দুনিয়ার মিডিয়া আজ সত্যিকার সেই মুক্তি তথা শরীয়তী শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রচার-প্রোপাগান্ডায় ব্যস্ত। এজন্য, এখানে নিজের দেখা ইসলামী ইমারত আফগানিস্তানের শরীয়তী শাসনব্যবস্থার কিছু বৈশিষ্ট্য তুলে ধরতে চাই। এই আলোচনা বর্তমান সময়ে আরও জরুরী মনে করছি; কারণ, সম্প্রতি ইরাক কেন্দ্রিক তথাকথিত খিলাফতের নামে চরমপন্থীদের কিছু কার্যক্রম জিহাদ ও শরীয়তী শাসনব্যবস্থার অনেক বদনাম করেছে। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি তথাকথিত এই খিলাফতের ঘোষণার মাধ্যমে জিহাদের নামে চরমপন্থাকে তাঁর রাস্তায় জিহাদ থেকে আলাদা করে দিয়েছেন।

- অনেকের ধারণা মুজাহিদরা মাথা গরম কিছু মানুষ, মোল্লা-মৌলভীরা কিভাবে দেশ চালাবে ... বাস্তবতা হল উসমানী খিলাফতের পতনের পর ইসলামী ইমারত আফগানিস্তান পৃথিবীর বুকে শরীয়তী শাসনব্যবস্থা ফিরিয়ে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়। **বৈশ্বিক শাসনব্যবস্থার মদদপুষ্ট উত্তরাঞ্চলীয় বিদ্রোহী জোটের সামরিক তৎপরতা, একের পর এক অর্থনৈতিক অবরোধের পরও ইসলামী ইমারত শরীয়তের উপর ভিত্তি করে আফগানিস্তানের রাষ্ট্রব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ১৯৯৮ সালের জুলাই মাসে সংবিধান প্রণয়ন করে**। ন্যাটো জোটের ৪৩টি

[22] সূরা আস সাফফঃ ১০-১৩

[23] সূরা আল আ'রাফঃ ১৭৯

দেশের সৈন্যদের আগ্রাসনের মুখেও ২০০৫ সালের জুন মাসে ইমারতের মজলিসে শুরা আবার এই সংবিধানের প্রতি তাঁদের সমর্থন পুনরায় ব্যক্ত করেন। বলাই বাহুল্য, ইসলামী ইমারতের সংবিধানের মূলনীতিতে শাসনব্যবস্থার ভার আল্লাহর উপর অর্পিত করে উল্লেখ করা হয়েছেঃ

يستقر نظام الحكم في إمارة أفغانستان الإسلامية على النص القرآني: (إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ)

অর্থাৎ ইসলামী ইমারত আফগানিস্তানে শাসনব্যবস্থা কুরআনের এই বাণী অনুযায়ী নির্ধারিতঃ

(আল্লাহ ছাড়া কারও বিধান দেবার ক্ষমতা নেই)[24]

- অনেকের মাঝে ভয় আছে শরীয়ত প্রতিষ্ঠা হলেই মানুষের হাত কাটা শুরু হয়ে যাবে, মানুষের শিরঃচ্ছেদ করা হবে, বাচ্চাদের স্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে, হাসপাতাল বন্ধ হয়ে যাবে ... । বাস্তবতা হল ইসলামী ইমারত এক সময় আফগানিস্তানে শরীয়ত দিয়ে শাসন করার পরেও, এখনও কোন জায়গা বিজয় করলে, সাথে সাথে সেখানে শরীয়তের এসব হুদুদ শাস্তি (হাত কাটা, শিরঃচ্ছেদ ইত্যাদি) দেওয়া শুরু করেনা। আর এটাই স্বাভাবিক; কারণ, শরীয়তের লক্ষ্যগুলো (দ্বীন, জান, মাল, সম্মান এবং মেধা) পূরণের নিশ্চয়তা দিতে না পারলে হুদুদ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। **ফলে, অনেক জায়গা বিজয়ের পরেও, ইমারত এখন সেসব জায়গায় জোরে-শোরে দ্বীনি তালিম ও প্রশিক্ষণ চালাচ্ছে।**
- বিজয়ের পরে কোন স্কুল বন্ধ হয়নি, বাচ্চারা যথারীতি স্কুলে যাচ্ছে। সরকারী কোন হাসপাতাল বন্ধ হয়নি, রোগীরা সেখানে চিকিৎসার জন্য যাওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন।
- **কাফেরদের সারিতে যুদ্ধ করা কেউ বন্দী হলে দেখিনি তাকে ভেড়া-ছাগলের মত জবাই করতে।** আমাদের নিজেদের ক্যাম্পেও একবার এক বন্দী ছিল। পরে তার আত্মীয়স্বজনরা এসে তাকে এই জামানত দিয়ে নিয়ে যায় যে, সে আর কোন দিন ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেনা। বন্দীরা আমাদের সাথে নামাযেও অংশ নেয়, তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করা হয়, খাবার বা শীতের মাঝে কোন কষ্ট দেওয়া হয়না। শুনেছি কোন কোন জায়গায় বন্দীকে সাপ্তাহিক হাটে নিয়ে যাওয়া হয়; এরপর গ্রামবাসীদের জিজ্ঞাসা করা হয় তার বিরুদ্ধে কোন যুদ্ধাপরাধ আছে কিনা, সাথে সাথে তাকে ক্ষমা করার জন্য উৎসাহিত করা হয়। একবার কিছু বন্দীর কথোপকথন দেখছিলাম। তাদের মাঝে একজন নিজের ভুল স্বীকার করে বলছিল, **আমরা সেনারা এত কিছু তো চিন্তা করিনা, আমাদেরকে লড়াই করতে বলা হয় আমরা লড়াই শুরু করি।**
- **বর্তমান প্রশাসনিক কাঠামোতে কোন নারী যুদ্ধ বন্দীকে দাসি বানানোর কোন সুযোগ নেই। আশা করি, পাঠকবৃন্দ ইউহোন রিডলীর (Yvonne Ridley) কথা জেনে থাকবেন।** তিনি যখন ইসলামী ইমারতের হাতে বন্দী ছিলেন, তখন মুজাহিদেরা তাঁর প্রতি সম্মান দেখানোর কারণে মুক্তি পাওয়ার পর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং জায়নবাদী ইহুদীদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমে পড়েন।
- **যুদ্ধে যেন গ্রামবাসীদের চাষের জমির কোন ক্ষয়ক্ষতি না হয়, সেজন্য খেয়াল রাখার জন্য ইমারতের নেতাদের পক্ষ থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়।** একবার গ্রামের বয়োজ্যেষ্ঠরা যুদ্ধে চাষের জমির ক্ষতির আশংকা করলে, আমাদের আমিরের কাছে এসে অভিযোগ করেন। তখন আমির আমাদের সবাইকে এই বিষয়ে খেয়াল রাখার জন্য বিশেষভাবে মনযোগী হতে বলেন।
- **আফগানিস্তানের জনসাধারণ আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের অনেক ভালবাসে, তাদের কাছে আমাদের মুসলমান পরিচয়টাই বড়, কে আফগানি কে আফগানি নয় এটা কোন বিষয় নয়।** একবার চারদিক থেকে আফগান সৈন্যরা আমাদের ঘিরে ফেলার মত অবস্থা হয়। আমরা পিছু হটে যাই, ভাগ-দৌড়ে গলা শুকিয়ে কাঠ, তখন দেখি গ্রামের এক ছেলে যুদ্ধের ময়দানে পানি নিয়ে আমার কাছে চলে এসেছে, আমাকে পানি পান করতে বলছে। আমি তাকে বললাম তুমি হলে নিরস্ত্র মুজাহিদ...।

পরিশেষে পাঠকদের কাছে অনুরোধ করব - আমরা কিভাবে জিহাদ করতে চাই তা জানার জন্য - আমাদের সংগঠনের আচরণবিধি (**আচরণবিধি - জামা'আত কায়েদাতুল জিহাদ উপমহাদেশ**) পড়ার জন্য। এটি পড়লে ইনশাআল্লাহ আমাদের

[24] ইসলামী ইমারত আফগানিস্তানের সংবিধান, পৃষ্ঠা ৩, ২য় অনুচ্ছেদ।

সম্পর্কে থাকা অনেক ভুল ধারণা দূর হয়ে যাবে। আল্লাহ আমাদের জিহাদকে কবুল করুন, আমাদের উপমহাদেশের মুজাহিদদের জিহাদকে উপমহাদেশের মানুষের জন্য শান্তি ও পথপ্রদর্শনের কারণ বানিয়ে দিন এবং ইসলামী ইমারতের সুশীতল ছায়া পুরো উপমহাদেশে বিস্তৃত করে দিন।

আর আমাদের সর্বশেষ কথা হল – সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য; আর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মুহাম্মাদ (ﷺ) এবং তাঁর বংশধর ও সাহাবা আজমায়িনদের উপর।

আপনাদের একনিষ্ঠ দু'আয় আমাদেরকে ভুলবেননা।

AN-NASR